মন্দা অর্থনীতির জন্য একটি টনিক প্রস্তাব

আমিনূল মোহায়মেন

বহু প্রতীক্ষিত দুর্নীতি দমন অভিযানের একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশের অর্থনীতির উপর। জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, গামেন্টসসহ বিভিন্ন কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছে এবং আর্থিক কর্মকান্ডের গতি হ্রাস পাচ্ছে। সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। এ অবস্থা চলতে থাকলে বেশ কয়েক বছর ধরে চলে আসা প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখাই যে শুধু অসম্ভব হয়ে পড়বে তাই নয়, বরং বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। দুর্নীতি দমন অভিযান কিভাবে অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিয়েছে এবং কিভাবে নিজেদের সম্পদ ও সামর্থ দিয়ে অর্থনীতিতে অতিরিক্ত প্রাণশক্তি যোগানোর মাধ্যমে সে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে বর্তমান নিবন্ধে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথমে দেখা যাক দুর্নীতি দমন অভিযান কিভাবে অর্থনীতিতে মন্দাভাব সৃষ্টি করেছে। যেহেতু দুর্নীতি ছিল অনেকটাই প্রকাশ্য এবং দুর্নীতিবাজদের কেশাগ্র স্পর্শ করা যাবে না - এটি ছিল একরকম নিশ্চিত, তাই দুর্নীতিলব্ধ অর্থের সিংহভাগ দেশেই বিনিয়োগ করা হয়েছিল। অনেকে সরাসরি দুর্নীতিতে লিপ্ত না হলেও বিরাট অংকের আয়কর ফাঁকি দেবার কারণে তাদের উপার্জনের একটি বড় অংশ অপ্রদর্শিত রয়ে যায়। এখন তারা সেই অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগ করতে ভয় পাচ্ছেন। আবার রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সরকারী জমি দখল করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার ইত্যাদি গড়ে তুলেছিল। সেগুলি ভাড়া নিয়ে যারা ব্যবসা চালাতো, তারা অসুবিধায় পড়েছে কেননা, অবৈধ স্থাপনাগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। বিগত সরকারসমূহের আমলে এমনভাবে আয়কর আইন তৈরী করা হয়েছিল যাতে দামী এপার্টমেন্ট ক্রয়ের মাধ্যমে নাম মাত্র কর দিয়ে কালো টাকাকে বৈধ করা যেতো। নির্মান শিল্পের দ্রুত বিকাশে তার একটি ভূমিকা ছিল বৈকি। যেমন একটি ব্যবস্থা ছিল যে, প্রতি বর্গমিটার হিসাবে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ সরকারকে কর হিসাবে দিলে সরকার সে আয়ের উৎস সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করতো না। আইনটি শুধু যে কালো টাকায় বিলাসবহুল এপার্টমেন্ট কেনাকে উৎসাহিত করেছে তাই নয়, বরং এর মাধ্যমে কালো টাকার মালিকদের জন্য কর ধরা হয়েছে বৈধ আয় ও নিয়মিত করদাতাদের থেকে ৩০ ভাগের এক ভাগ। যেমন ধরুন, রাজধানীর অভিজাত এলাকায় ২০০০ বর্গফুটের একটি এপার্টমেন্ট কিনতে প্রয়োজন এক কোটি টাকার মত। এক কোটি টাকাকে নিয়মিত আয়কর দিয়ে বৈধ আয় হিসাবে দেখাতে একজন নাগরিককে ১৫ লক্ষ টাকার মত আয় কর দিতে হবে। অপর দিকে প্রতি বর্গফুট হিসাবে কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করতে চাইলে তাকে দিতে হতো ৫০ হাজার টাকার মত। বর্তমানে এই ব্যবস্থাটি বাতিল করার ফলে এপার্টমেন্ট ব্যবসাতে মন্দাভাব চলছে।

অর্থনীতির এই মন্দাভাব কাটাতে তাহলে কি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে? বন্ধ করে দিতে হবে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান? কর ফাঁকি রোধ করে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতা কমানোর যে সাহসী উদ্যোগ রাজস্ব বোর্ড নিয়েছে তাতে ইতি টানতে হবে? নিশ্চয়ই কোন দেশপ্রেমিক নাগরিক তা চাইবেন না। দুর্নীতিলব্ধ অর্থ দিয়ে যে অর্থনীতির প্রাণশক্তি সরবরাহ করা হয় তার ভিত্তি থাকে অতি দুর্বল। সে অর্থনীতিতে একদিকে যেমন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ে, তেমনি সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উদ্যোগীর ভূমিকা রাখতে পারে না। তাতে জনগণের অধিকাংশের

উদ্যোম, মেধা ও সামর্থ থেকে অর্থনীতি বঞ্চিত হয় যা আমাদের মত ঘনবসতির দেশের জন্য ক্ষতিকর। দুর্নীতি দমন অভিযান হচ্ছে, জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়া ব্যাধি সারাতে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের মত। এন্টিবায়োটিক যেমন রোগীর শরীরকে সাময়িকভাবে হলেও দুর্বল করে দেয়, তেমনি দুর্নীতিবিরোধী অভিযানও স্বল্পমেয়াদে হলেও অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিয়েছে। এন্টিবায়োটিক যত শক্তিশালী হবে, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও ততো বেশী হবে। ডোজ পূর্ণ না করে এন্টিবায়োটিক সেবন বন্ধ করে দিলে যেমন হিতে বিপরীত হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই হতে পারে। এ রকম পরিস্থিতিতে ডাক্তারেরা ঔষধ বন্ধ না করে দিয়ে বরং দেহের জন্য শক্তিবর্ধক টনিকের ব্যবস্থা করেন। দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে ক্লান্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্যও একই কাজ করতে হবে।

আমাদের অর্থনীতির জন্য বাড়তি শক্তি যোগানোর দুটো পথ রয়েছে। একটি হচ্ছে, উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে তার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও অর্থপ্রবাহ সৃষ্টি করা। কিন্তু এর জন্য সরকারকে অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। সে অর্থ আসতে পারে রাজস্ব আয় বাড়ানোর মাধ্যমে অথবা বৈদেশিক ঋণদাতা দেশ বা সংস্থাগুলো থেকে ঋণ নেয়ার মাধ্যমে। কিন্তু, অর্থনীতির মন্দাভাবের জন্য সরকারের রাজস্ব আয় না বেড়ে বরং কমে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে, যদিও অনেকে ধারণা করেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলো এ সরকারের আমলে ঋণ ও অনুদানের প্রবাহ অনেক বাড়িয়ে দেবে, কিন্তু বাস্তবে সে রকমটি ঘটতে দেখা যাচ্ছে না। ফলে এ পথে অর্থনীতির বাড়তি পুষ্টি যোগানোর আশা করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে, সামর্থবান জনগণের যে অংশটি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিরুদ্যোগী রয়েছে তাদেরকে উদ্যোগী করা এবং তাদের অলস উদ্যোম, মেধা, অর্থ ও সামর্থ্যকে অর্থনীতির চালিকাশক্তির সাথে সংযুক্ত করা। আমাদের অর্থনীতিতে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে থাকে জনগণের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ। শিক্ষিত ও স্বচ্ছল বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির ভূমিকা এক্ষেত্রে পরোক্ষ এবং উদ্যোগহীন। তাদের অর্থ, শিক্ষা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানো গেলে যে বাড়তি পুষ্টির কথা বলা হচ্ছে তা সহজেই পাওয়া যাবে।

অর্থনীতিতে প্রাণশক্তি যোগাতে নিরুদ্যোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি যে একটি অকল্পনীয় ভূমিকা রাখতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা পাবার জন্য একটি ছোট পরীক্ষা করা যাক। যদি ঘোষণা করা হয় যে, স্নাতোকোত্তীর্ণ তরুণ-তরুণীদেরকে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রত্যেককে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি সরকারী চাকুরী দেয়া হবে তাহলে কতজন এর জন্য আবেদন করবে? কমপক্ষে দশ লক্ষ। এর অর্থ হচ্ছে কমপক্ষে দশ লক্ষ বেকার শিক্ষিত তরুণ-তরুণী রয়েছে যারা তাদের কর্মসংস্থানের জন্য জনপ্রতি এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে সমর্থ্য ও প্রস্তুত। চাকুরীর জন্য যে অর্থ তারা ব্যয় করতে প্রস্তুত তা দিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের বিভিন্ন ধরণের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড যেমন মাছের পুকুর, মুরগীর খামার, দুধের খামার, গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প, হাস-মুরগীর খামার, ফল চাষ, রেশম চাষ ইত্যাদি এন্টারপ্রাইজ তৈরী করতে পারে। আবার কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী এসেমব্লী করা, প্লাস্টিক সামগ্রী ও খেলনা তৈরী, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরী ও ফার্নিচার তৈরীর মত ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের বিভিন্ন শিল্পও তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। উক্ত বিনিয়োগের ফলে শুধু উক্ত দশ লক্ষ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানই যে হবে তা নয়, বরং তাদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে আরও কয়েকগুণ (সত্তর-আশি লক্ষ) মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এই বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার কারণে যে অর্থপ্রবাহ দেখা দিবে তার কারণে আরও অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

এতো গেলো শিক্ষাগত, শারীরিক ও আর্থিকভাবে সমর্থ্য কিন্তু কর্মহীন নাগরিকদের মাত্র একটি অংশের কথা। জনগণের একটি বিশাল অংশ রয়েছে যারা ১০-৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করতে পারবে। আবার ১০-২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে পারবে এ ধরণের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর সংখ্যাও একেবারে কম নয়। তাদের মধ্য থেকে আরও উদ্যোক্তা তৈরী করে আনা যাবে এবং তার ফলে অতিরিক্ত কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। সব মিলিয়ে এক কোটি অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। এক কোটি মানুষের প্রত্যেকে গড়ে মাসে চার-পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন করলে বাংলাদেশের জিডিপিতে যুক্ত হবে অতিরিক্ত পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের জিডিপি ছিল ৪,৬৭,৫০০ কোটি টাকা। এ হিসাবে ৫০,০০০ কোটি টাকা জিডিপিতে অতিরিক্ত যুক্ত হলে শুধু এর ধেকেই জিডিপি প্রবৃদ্ধি ঘটবে ১০ শতাংশ। ফলে মোট জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬-৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাড়াবে ১৫ শতাংশেরও বেশীতে। অর্থাৎ, আমাদের নাগরিকদের যে ধরণের আর্থিক ও শিক্ষাগত সঙ্গতি রয়েছে তা দিয়েই জিডিপি ১৫% শতাংশ বৃদ্ধি করা যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতো বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জনগণের এই বিশাল অংশটি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে চালিকাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে না কেন? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য থেকে উদ্যোক্তা সৃষ্টি না হবার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের কর্মহীনতার উত্তরাধিকার। এ দেশে হাজার হাজার বছর ধরে বর্ণবাদী সমাজ ব্যবস্থা চালু ছিল যার সর্বনিম্ন স্তরে রাখা হয়েছিল তাদেরকে যারা উৎপাদন ও কৃৎকৌশলের সাথে যুক্ত ছিল। অনেকক্ষেত্রে তাদেরকে অস্পৃশ্য মনে করা হতো। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তরুণদের একটি বিরাট অংশ উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেদেরকে দেখতে চাইছে না মূলতঃ সামাজিক কারণে। চাকুরের তুলনায় উদ্যোক্তার কোন মর্যাদাই সমাজের নিকট নেই। নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো সাবজেক্টে মাস্টার্স পাশ করে যদি কোন তরুণ ঠিক করে যে, তার এলাকায় গিয়ে একটি ডেইরী ফার্ম করবে, তাহলে তাকে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকল মহল থেকেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে। এমনকি তার বিয়ে নিয়েও সমস্যা তৈরী হবে। তাছাড়া কারিগরি ও ব্যবসায়িক জ্ঞানের অভাবও এ ক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। আবার আর্থিক নিরাপত্তা বোধের অভাবও মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীকে উদ্যোক্তা হতে বাধা দেয়। নিজে উদ্যোক্তা হয়ে কিছু করার মধ্যে যে ঝুঁকি থাকে তা নেয়ার মত মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি এখনও আমাদের মধ্যবিত্ত তরুণেরা অর্জন করেত পারেনি। বিষয়টি বিস্ময়কর। নেতা-নেত্রীকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য যে তরুণ জীবন দেয়ার ঝুকি নিতে পারে, সে নিজে একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়ার জন্য কিছুটা আর্থিক ঝুকি নেয়ার মত সাহস দেখায় না। এ কারণে দেখা যায়, বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদের সন্তানেরাই কেবল ব্যবসা করে, অন্যরা তাদের অধীনে চাকুরী করেই জীবন কাটাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের থেকে উদ্যোক্তা সৃষ্টি না হবার প্রধান কারণ মানসিকতা। আশার কথা হলো, অল্প সময়ে মানসিকতার উন্নয়ন ও পরিবর্তনে আমরা অবিশ্বাস্য রকমের সাফল্য দেখিয়েছি। উদাহরণ হিসাবে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা বলা যায়। জনগণের ধর্মপ্রবণতা ও শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০০ সালে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫৯ শতাংশে নেমে আসে যা পাকিস্তান, সিরিয়া, নেপাল, মিসর, ইসরাইল, ভারত ইত্যাদি দেশের থেকেও কম ছিল। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাফল্য থেকে শিক্ষা নিয়ে এক মিলিয়ন উদ্যোক্তা সৃষ্টির কর্মকৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে। উক্ত সাফল্যের মূলে যে বিষযগুলি কাজ করেছে, তা হচ্ছে, গণমাধ্যম, পাঠ্যপুস্তক, স্থানীয় সরকার, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবারের সুফল নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো

হয়েছে এবং সাথে সাথে পরিবার পরিকল্পার সহায়ক উপকরণ ও সামগ্রী জনগণকে তাদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ফ্যামিলি প্লানিং ভিজিটরেরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে নারীদেরকে পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাদেরকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিনামূল্যে দিয়ে এসেছেন।

একই ভাবে এক মিলিয়ন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে এবং সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের দোরগোড়ায় এ বিষয়ক কারিগরি সহায়তা পৌঁছে দিতে হবে। এ জন্য সরকারকে ক্যাটালিস্টের ভূমিকায় বড়-সড় উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, ঠিক যেভাবে পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে কৃষি, মৎস ও পশুসম্পদ, শিল্প, যুব ও ক্রীড়া, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে সরকারকে একটি বড় প্রকল্প বা কর্মসূচি নিতে হবে। প্রকল্পটির কাজ হতে পারে নিম্নরূপঃ

১. প্রকল্পের একটি গবেষণা সেল থাকবে যার কাজ হবে গবেষণা করে বের করা যে, তরুণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা কি কি ধরণের এন্টারপ্রাইজ তৈরী করতে পারে, সেগুলির করতে কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, কত মূলধনে কি পরমাণ লাভ কত সময়ে পাওয়া যাবে, কি কি যন্ত্রপাতি, অন্যান্য সরঞ্জাম ও উপকরণ প্রয়োজন, সেগুলি কোথায় পাওয়া যায়, কি দক্ষতার কত সংখ্যক কর্মী দরকার, কর্মীদের কোন বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে কিনা, উৎপাদিত পণ্যের সম্ভাব্য বাজার কোথায়, কিভাবে বাজারজাত করতে হবে ইত্যাদি। এ বিষয়গুলি নিয়ে একটি উদ্যোক্তা গাইড বের করতে হবে। এন্টারপ্রইজ তৈরীতে যে সকল আইনগত বিষয় ও ফরমালিটি রয়েছে সেগুলির বিস্তারিত বিবরণও তাতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ গরু মোটাতাজাকরণ খামারের কথা ধরা যাক। এ প্রসঙ্গে গাইডটিতে বলতে হবে এ ধরণের খামার শুরু করতে গেলে কত টাকা নিয়ে নামতে হবে, কত দিন পর কি হারে লাভ আসতে পারে, কি বয়সের কোন জাতের গরু কিনতে হবে, সেগুলি কোথায় পাওয়া যাবে, গরু গুলোকে কোথায় কি পরিবেশে রাখতে হবে, কিভাবে তাদের পরিচর্যা করতে হবে, তাদেরকে কি খাওয়াতে হবে, সে খাবার কোথায় পাওয়া যাবে, কোন সময়ে মোটাতাজা গরু বিক্রি করা যাবে ইত্যাদি। গাইডটি প্রিন্ট করে স্বল্পমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি তাকে ইন্টারনেটে এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ সিডি মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

২. গবেষণা সেলের তৈরী উদ্যোক্তা গাইডের উপর ভিত্তি করে তরুণ-তরুণীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণে উদ্দেশ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্যোক্তা মেলার আয়োজন করা যেতে পারে। সে সকল মেলায় তাদেরকে দেখাতে হবে কত সহজে তারা চাকুরে থেকে মালিক হতে পারে। কোন ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়তে কত অর্থ ও কি ধরেণের কাঁচামাল প্রয়োজন, সেগুলি কোথায় পাওয়া যাবে, যন্ত্রপাতি লাগলে তার মূল্য কত ও কোথায় পাওয়া যায়, সেগুলি চালাতে কেমন ধরণের অপারেটার প্রয়োজন, সে উদ্যোগ থেকে কেমন লাভ হবে ইত্যাদি বিষয় সেখানে প্রদর্শন করা হবে।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া মধ্যবিত্তের মানস গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই মাধ্যমকে ব্যবহার করতে হবে। জনপ্রিয় নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীগণকে দিয়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি বিষয়ে ধারাবাহিক নাটক তৈরী করে টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রচার করা হলে আশাতীত ফল পাওয়া যেতে পারে। আজকাল টক শো, লাইভ আলোচনা ইত্যাদির প্রচলন বেড়েছে। উদ্যোক্তা সৃষ্টি নিয়েও এ ধরণের লাইভ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। অনুষ্ঠানের এক এক পর্বে এক একটি

এন্টারপ্রাইজ নিয়ে আলোচনা হবে। আলোচকগণ দর্শক-শ্রোতাদের এ বিষয়ক প্রশ্নের লাইভ উত্তর দিবেন। মোট কথা, এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণার এমন একটি ঝড় তুলতে হবে যাতে দেশের কোন তরুণ-তরুণীই এ বিষয়ে উদাসীন না থাকতে পারে।

৩. এন্টারপ্রাইজ তৈরীতে প্রয়োজনীয় কারগিরী সহায়তা সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে উক্ত প্রকল্প থেকে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের একটি তালিকা তৈরী করা যেতে পারে। কাজটি খুব কঠিন নয়। পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর গ্রাজুয়েটদের তালিকা সংগ্রহ করে নিয়ে একটি কম্পিউটার ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হলে তাদের শিক্ষার ক্ষেত্র অনুযায়ী তাদেরকে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কারিগরি সহায়তা সেবা দেয়া সহজ হবে। পাশাপাশি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েও সম্ভাব্য উদ্যোক্তা খোঁজা যেতে পারে। তাছাড়া যুব উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে উদ্যোক্তা সেবার জন্য বিশেষ সেল খুলে তার মাধ্যমে আগ্রহী তরুণ-তরুণীদেরকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। পাশাপাশি একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করতে হলে যে যে ফরমালিটিজ রয়েছে সেগুলি সম্পন্ন করতেও তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। এন্টারপ্রাইজ চালাতে যে ধরণের প্রাথমিক হিসাবরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জ্ঞান প্রয়োজন, তার উপরে এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে আগ্রহীদেরকে প্রশিক্ষেণের ব্যবস্থাও করতে হবে। এক্ষেত্রে এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে কেননা, তাদের ইতোমধ্যেই এ জাতীয় সেবা অন্ততঃ কাগজে কলমে দিয়ে থাকে।

৪. সম্ভাব্য উদ্যোক্তারা এক এক করে মাঠে নামা শুরু করলে এক পর্যায়ে তাদের জন্য ঋণের প্রয়োজন হবে। ঋণের অর্থ যোগান দেয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য কঠিন কিছু হবে না, কেননা, ব্যাংকগুলোতে প্রচুর অলস অর্থ পড়ে রয়েছে। তবে জামানতের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সহজে উদ্যোক্তারা ঋণ পাওয়া যায় এবং প্রদত্ত ঋণের অর্থ সময়মত আদায় হয়। প্রকল্পের গবেষণা সেল এ বিষয়েও সরকারকে পরামর্শ প্রদান করবে।

এক মিলিয়ন উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রকল্পটি দেশের অর্থনীতির জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবে। দশ লক্ষ শিক্ষিত ও সামর্থ্যবান তরুণ-তরুণীর উদ্যোম, মেধা, স্বপ্ন ও পরিশ্রম দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তির সাথে যুক্ত হলে তা এমন একটি গতিবেগ সৃষ্টি করবে যা বাংলাদেশকে এক-দুই বছরে কয়েক যুগ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর প্রভাব পড়বে রাজনীতিতেও। রাজনীতিতে বর্তমানে যে নেতিবাচকতা ও ধ্বংস প্রবণতা রয়েছে, তার প্রধান কারণ, তরুণদের মধ্যে হতাশা। যখন ছাত্র-ছাত্রীরা দেখবে কত সহজে তাদের সিনিয়র ভাই-বোনেরা নিজেদের উদ্যোগ, উদ্যোম, মেধা ও শ্রম দিয়ে স্বচ্ছ পথে সমৃদ্ধির অধিকারী হচ্ছে, তখন গাড়ী ভাঙচুরের মাধ্যমে রাজপথের লড়াকু সৈনিক হবার চেয়ে উদ্যোক্তা হবার মাধ্যমে রাজপথে নিজের গাড়ী চালিয়ে বেড়াবার আগ্রহ তার অনেক বেশী থাকবে। এই সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অনেকেই এক সময়ে বড় বড় শিল্পপতিতে পরিণত হবে। তখন জাপানের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনার তত্বটি সত্যি সত্যি বাস্তবে রূপ নেবে। অকল্পনীয় সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের নবযাত্রার পথটি উন্মোচন করতে পারে এক মিলিয়ন উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রস্তাবিত প্রকল্পটি। সরকারের নীতি নির্ধারকগণ দ্রুত বিষয়টি অনুধাবন করে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এটিই আমাদের প্রত্যাশা।